

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার

রোলঃ 2280214492310

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার

রোলঃ 2280214492310

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা আক্তার, আইডিঃ 2280214492310 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

খাদিজা আক্তার

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ 2280214492310

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা.....	5
জিহাদের উৎস ও ভিত্তি	6
জিহাদের প্রকারভেদ.....	7
জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?	12
জিহাদের মূলনীতি.....	17
জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়?	22
জিহাদ কত হিজরিতে ফরজ হয়েছে?.....	25
জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা.....	28
কুরআনুল কারিমে জিহাদের গুরুত্ব	33
কুরআনুল কারিমে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা	36
হাদিস শরিফের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব, মর্যাদা ও ফজিলত.....	39
জিহাদের এক অনন্য উদাহরণ	43
ইসলামী সমাজে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ভূমিকা.....	45
কুরআনের আলোকে শহীদের মর্যাদা ও পুরস্কার.....	47
হাদিস শরীফে শহীদের মর্যাদা, পুরস্কার ও ফজিলত	49
বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষার আবশ্যিকতা	51
উপসংহার	54

ভূমিকা

জিহাদ ইসলামের ইজতেমায়ী ফরয আমলসমূহের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ফরয। এটি নিছক একটি বৈকল্পিক ইবাদত নয়; বরং তা মুমিনের ব্যক্তি জীবন, সমাজ বিনির্মাণ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার এক অপরিহার্য কর্মসূচি। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এটি ইসলামি আকিদা ও অনুশীলনের একটি মৌলিক ও বহুমাত্রিক পরিভাষা, যা কেবল সশস্ত্র সংগ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, মানব সেবা, পিতা-মাতার আনুগত্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণের মতো বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। অপরদিকে, জিহাদের প্রয়োজনীয়তা নিহিত রয়েছে আত্মরক্ষা, ফিতনা নির্মূল, নিপীড়িত মানবতার উদ্ধার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতায়। এর ফজিলত কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত অগণিত পার্থিব ও পরলৌকিক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতে সমুজ্জ্বল। পরিতাপের বিষয়, সমকালীন বিশ্বে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও কৌশলী অপপ্রচারের শিকার হয়ে জিহাদ সন্ত্রাস ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে অভিন্নার্থে গণ্য করা হয়, অথচ ইসলামী অনুশাসনের মর্মমূলে জিহাদ একটি সুসংহত নৈতিকতা, কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও মানবিক চেতনায় মণ্ডিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কখনোই ইসলামি জিহাদের লক্ষ্য হতে পারে না; বরং জিহাদ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগের এক পবিত্র নাম। বস্তুত, জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে মূল উৎসের প্রতি প্রত্যাবর্তন এবং এর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঠিক অনুধাবনই একমাত্র অপরিহার্য ও অনুসরণীয় পথ।

জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

‘জিহাদ’ (الجهاد) শব্দটি কুরআন-হাদিসে বহুল ব্যবহৃত একটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয়, যার অর্থগত ব্যাপ্তি ও প্রায়োগিক গভীরতা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ শব্দটির অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো, এর আভিধানিক অর্থের বহুমাত্রিকতা এবং পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপকতা সম্পর্কে সাধারণের অজ্ঞতা। “জিহাদ” (الجهاد) শব্দের ভাষাগত বা আভিধানিক অর্থ হলো সংগ্রাম করা, প্রচেষ্টা চালানো, সাধনা করা। এটি আরবি ত্রিবর্ণী মূলধাতু ‘জা-হা-দা’ (ج-ه-د) থেকে উৎসারিত, যার অর্থ কষ্ট বা সাধনা।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে জান-মাল, সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করাকে জিহাদ বলা হয়।

আরবি ভাষার প্রখ্যাত অভিধান ‘লিসানুল আরব’-এর প্রণেতা ইবনে মানযুর (রহ.) বলেন, “আল-জাহদ (الْجُحْدُ) ও আল-জুহদ (الْجُهِدُ) উভয়ের অর্থ হলো শক্তি ও সামর্থ্য। জিহাদ হলো শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা।” (লিসানুল আরব, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৩)।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ‘ফাতহুল বারি’-তে বলেন, “শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ হলো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা।” (ফাতহুল বারি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২)।

ইমাম নববি (রহ.) “মিনহাজুত তালিবীন” গ্রন্থে বলেন, “জিহাদ হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।” তবে তিনি এর সাথে আত্মিক ও আর্থিক জিহাদকেও এর আওতাভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) জিহাদের পরিধি বিস্তৃত করে বলেন, “জিহাদ হলো আল্লাহর দীনকে সর্বোচ্চ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এটি কখনো অন্তর দ্বারা, কখনো মুখ দ্বারা, কখনো সম্পদ দ্বারা, আবার কখনো হাত দ্বারা হয়ে থাকে।” (মাজমু‘ ফাতাওয়া, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ২৪৮)।

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফকিহ শাইখ ইউসুফ আল-কারদাভি (রহ.) জিহাদের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন, “জিহাদ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে জান-মাল, সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা। এটি সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি দাওয়াত, শিক্ষা, সমাজসেবা ও রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমেও হতে পারে।” (ফিকহুল জিহাদ, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮)।

জিহাদের উৎস ও ভিত্তি

ইসলাম একটি সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার আইনি রূপ বা শরিয়তের প্রতিটি বিধানের পশ্চাতে রয়েছে সুস্পষ্ট দলিল ও অকাট্য ভিত্তি। জিহাদ ইসলামের একটি মৌলিক ও গুরুত্ববহ বিধান, যা ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে সামষ্টিক প্রতিরক্ষা

ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ বিধানের বৈধতা, পরিধি ও প্রয়োগ পদ্ধতি শরিয়তের স্বীকৃত উৎসসমূহের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইনশাস্ত্রের (উসূলে ফিকহ) মূলনীতি অনুসারে, শরিয়তের যাবতীয় বিধানের উৎস চারটি:

- (১) আল-কুরআন,
- (২) হাদিস বা সুন্নাহ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি),
- (৩) ইজমা (মুজতাহিদ আলেমদের ঐকমত্য) এবং
- (৪) কিয়াস (কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলনামূলক সিদ্ধান্ত)।

জিহাদের বিধানও এই চারটি উৎসের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যা একে শরিয়তের অকাট্য বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জিহাদের প্রকারভেদ

প্রখ্যাত আলেম ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়া (রহ.) তাঁর ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে জিহাদকে প্রধান ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন (নফস, শয়তান, কাফির-মুনাফিক এবং সমাজ-রাষ্ট্রের অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে)। তাঁর এই শ্রেণিবিন্যাসই পরবর্তী ফকিহ ও গবেষকদের জন্য মূল ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। মাধ্যম ও স্তর হিসেবে এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, যার প্রধান প্রকারগুলো হলো—

১. জিহাদুননফস (নফসের জিহাদ),
২. জিহাদুশ শাইতান (শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ),
৩. জিহাদ বিল ইলম (জ্ঞানের জিহাদ),
৪. জিহাদ বিল লিসান (বাক্যের জিহাদ) এবং
৫. জিহাদ বিস সাইফ (সশস্ত্র জিহাদ)

জিহাদুননফস

জিহাদুননফস বা আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ হলো মানুষের নিজের কুপ্রবৃত্তি, পাপপ্রবণতা, লোভ, হিংসা, অহংকার, কামনা-বাসনা ও আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বানকারী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের

নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা, তাকওয়া অর্জন করা এবং তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকার এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থঃ “আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখিয়ে দেব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।” (সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৬৯)

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর পথে এই চেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্যে নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ইবাদতে দৃঢ়তা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল ধরনের প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

“প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।” (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ১৬২১; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৭০৬) এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুমিনের জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহর বিধানের অধীন করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্যিক সংগ্রামের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি ও নফসের সংশোধনও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের আলেম ও সালাফে সালাহিন নফসের সংশোধনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর সেনাপতিদের উপদেশ দিতেন যেন তারা শত্রুর মোকাবিলার পাশাপাশি নিজেদের গুনাহ ও নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকেও সতর্ক থাকে। কারণ মানুষের পাপ ও অবাধ্যতা অনেক সময় বাহ্যিক শত্রুর চেয়েও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এছাড়া ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালি (রহ.) আত্মশুদ্ধি ও নফসের সংশোধনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, মানুষের প্রকৃত সফলতা অর্জিত হয় তখনই, যখন সে নিজের অন্তরের দুর্বলতা, প্রবৃত্তি ও পাপপ্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হতে পারে।

অতএব, জিহাদুন নফস একজন মুসলমানের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি এমন এক ধারাবাহিক আত্মিক সংগ্রাম, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে,

আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের পথে অগ্রসর হয়।

জিহাদুশ শাইতান

জিহাদুশ শাইতান হলো শয়তানের প্ররোচনা, কুমন্ত্রণা ও ধোঁকার বিরুদ্ধে মুমিনের নিরন্তর সংগ্রাম। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, যে সর্বদা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ “নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্যেই, যাতে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়।” (সূরা ফাতির, ৩৫:৬)

মানুষের অন্তরে শয়তান যখনই কোনো পাপের বা সন্দেহের বীজ বুনে দিতে চায়, তখনই সচেতনভাবে আল্লাহর স্মরণ ও আশ্রয়ের মাধ্যমে তা প্রতিহত করাই হলো এই জিহাদের মূল কাজ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ “আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল-আরাফ, ৭:২০০)

মানবদেহে শয়তানের প্রভাব ও তার সূক্ষ্ম প্রবেশাধিকার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন:

“শয়তান আদম সন্তানের রক্তপ্রবাহে চলাচল করতে পারে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০৩৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও শিখিয়েছেন যে, শয়তানের কোনো ধোঁকা বা চক্রান্তে পড়ে তাকে গালমন্দ বা লা'নত করে নিজের সময় নষ্ট করার চেয়ে আল্লাহর শক্তির ওপর ভরসা

করা এবং তাঁর আশ্রয় নেওয়া অনেক বেশি কার্যকর। সাহাবি হযরত আবুল মালিহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন:

“তোমরা ‘শয়তান ধ্বংস হোক’ (বা শয়তানের ওপর লানত) এমন কথা বলো না। কারণ এতে সে অহংকারে ফুলে-ফেঁপে একটি ঘরের মতো বড় হয়ে যায় এবং বলে, ‘আমি আমার শক্তি দিয়ে তাকে ফেলে দিয়েছি।’ বরং তোমরা বলো ‘বিসমিল্লাহ’ (আল্লাহর নামে শুরু করছি)। এতে সে অপমানে ও হীনতায় একটি মাছির মতো ছোট হয়ে যায়।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৮২)

অতএব, জিহাদুশ শাইতানের প্রধান হাতিয়ার হলো আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, ইস্তিগফার, তাকওয়া অবলম্বন, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তির ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

জিহাদ বিল ইলম

জিহাদ বিল ইলম হলো অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অকাট্য দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও বিধানকে মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা এবং বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় ও অপপ্রচারের জবাব প্রদান করা এ জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থঃ “অতএব তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং এই (কুরআন)-এর মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে মহা জিহাদ পরিচালনা করো।” (সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২)

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু এ আয়াতটি মক্কি যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাই এখানে ‘মহা জিহাদ’ বলতে মূলত কুরআনের শিক্ষা, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাতিলের মোকাবিলা করাকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) প্রমুখ সালাফের ব্যাখ্যাতেও এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

এই জ্ঞানভিত্তিক সংগ্রামের প্রধান শক্তি হলো বিশুদ্ধ দ্বীনি জ্ঞান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৩৭)

জিহাদ বিল ইলম কেবল মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করতেই সহায়তা করে না; বরং ইসলামের সত্যতা, সৌন্দর্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং যুক্তিনির্ভর শিক্ষাকে মানবজাতির সামনে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। তাই জ্ঞান অর্জন, তা সঠিকভাবে প্রচার করা এবং দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আমল।

জিহাদ বিল লিসান

জিহাদ বিল লিসান হলো মুখের ভাষা, কলম ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য প্রচার, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার হওয়া। আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন মুসা (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে গিয়ে নরম ভাষায় সত্য বলার নির্দেশ দেন। (সূরা ত্বা-হা, ২০:৪৩-৪৪)।

সমাজ থেকে অন্যায় দূরীকরণে মুখের ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কোনো মন্দ কাজ দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে; যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মুখ দ্বারা; আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তর দ্বারা (তা ঘৃণা করবে); আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৯)।

এই হাদিসটি স্পষ্ট করে, হাত দিয়ে অন্যায় বাধা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে মুখের ভাষায় প্রতিবাদ করাই একজন মুমিনের প্রধান দায়িত্ব।

জিহাদ বিস সাইফ

জিহাদ বিস সাইফ বা কিতাল হলো অস্ত্রের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম, যা জিহাদের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ। ইসলামি শরিয়তের কঠোর শর্ত সাপেক্ষে, বৈধ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অধীনে— আত্মরক্ষা, নিপীড়িতদের উদ্ধার এবং দীন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অনুমোদিত।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অর্থঃ “আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৯৩)।

ইসলামি ফিকহবিদদের মতে, এই সশস্ত্র সংগ্রাম বা কিতাল বৈধ ও পরিচালনার জন্য অপরিহার্য শর্ত ও নীতিগুলো হলো:

১. বৈধ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব ও নির্দেশ।
 ২. আত্মরক্ষা, নিপীড়নের অবসান বা শত্রুর আগ্রাসন মোকাবিলার মতো সুনির্দিষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত কারণ।
 ৩. শত্রুর মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সামর্থ্য, শক্তি ও সামরিক প্রস্তুতি।
 ৪. যুদ্ধকালীন কঠোর মানবিক নীতিমালা মেনে চলা; যেমন—নারী, শিশু, বৃদ্ধ, নিরস্ত্র ব্যক্তি, ধর্মযাজক হত্যা এবং ফসল, গাছপালা ও স্থাপনা ধ্বংসের নিষেধাজ্ঞাসহ সব ধরনের সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকা (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৩১; মুয়াত্তা মালিক, হাদিস নং ৯৪৬)।
 ৫. যুদ্ধ চলাকালীন শত্রুপক্ষ যদি আন্তরিকভাবে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রহণ করা (সূরা আল-আনফাল, ৮:৬১)।
- অধিকাংশ ইসলামি স্কলার ও ইমাম নববি (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী, ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা বা দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে এটি মূলত ‘ফরযে কিফায়া’ (সমষ্টিগত দায়িত্ব)। তবে শত্রু যদি সরাসরি মুসলিম ভূখণ্ড আক্রমণ করে, তখন আক্রান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য তা ‘ফরযে আইন’ (ব্যক্তিগত আবশ্যিক দায়িত্ব) হিসেবে গণ্য হয়।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

কুরআন ও সুন্নাহর গভীর পর্যালোচনায় প্রতিভাত হয় যে, জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কখনোই জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ, ভূখণ্ড দখল, সম্পদ লুণ্ঠন বা ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা নয়; বরং এর মূল অভিষ্ট হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, নিপীড়িত মানবতার সুরক্ষা, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল এবং ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি। এটি কেবল যুদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টাকে বোঝায়। কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে বহু নির্দেশনা এসেছে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হলো—

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

জিহাদের সর্বপ্রথম ও প্রধানতম লক্ষ্য হলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ইসলামী দর্শনে যেকোনো ইবাদতের মূল প্রাণশক্তি হলো ‘ইখলাস’ বা বিশুদ্ধ নিয়ত, এবং জিহাদও এর ব্যতিক্রম নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থঃ “এবং তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি।” (সূরা আল-হজ্জ, ২২:৭৮)

এই আয়াতটি জিহাদকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার এবং তা যথাযথভাবে সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তখন তিনি উত্তর দেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে রয়েছে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১২৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯০৪)

এই হাদিসটি সুস্পষ্ট করে যে, জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি; কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ, খ্যাতি বা পার্থিব লাভের আশা নয়। ইমাম নববি (রহ.) বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে যে, নিয়তের বিশুদ্ধতা জিহাদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য অপরিহার্য শর্ত।

২. অত্যাচার ও নিপীড়ন দূর করা

জিহাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো সমাজে বিদ্যমান অত্যাচার, জুলুম ও নিপীড়ন দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোকে একটি মহৎ ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা নির্যাতিতদের পক্ষে যুদ্ধ না করার জন্য মুসলিমদের তিরস্কার করে বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

অর্থঃ “আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং সেইসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে লড়াই করছ না—যারা বলছে, ‘হে আমাদের রব! এই অত্যাচারী অধিবাসীদের শহর থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যান এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক বানিয়ে দিন আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী খাড়া করে দিন’।” (সূরা আন-নিসা, ৪:৭৫)

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি এমন এক নির্দেশ, যা মুসলিমদেরকে সর্বদা নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে এবং তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসতে আহ্বান করে, তা তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম।

৩. ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ

ইসলামী সমাজে ফিতনা (ধর্মীয় নিপীড়ন, সামাজিক অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা) প্রতিরোধ করা জিহাদের একটি অপরিহার্য লক্ষ্য। কুরআনে ফিতনাকে হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ “আর তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে। বস্তুত ফিতনা (উপদ্রব বা বিশৃঙ্খলা) হত্যার চেয়েও মারাত্মক। তবে মসজিদে হারামের (কাবা শরিফ) নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু যদি তারা নিজেরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করো। এটাই কাফেরদের শাস্তি।” (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১)

অতঃপর ফিতনা নির্মূলের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অর্থঃ “আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৩)

ইমাম তাবারি (রহ.)-এর মতে, এখানে ‘ফিতনা’ বলতে ধর্মীয় নিপীড়ন, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ এবং সমাজে অরাজকতা সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, জিহাদের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজ থেকে ফিতনা নির্মূল করে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

৪. আত্মরক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

ইসলামে অন্যায় আগ্রাসন বা জুলুমের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ শুরু করা কখনোই অনুমোদিত নয়; কিন্তু আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করা কেবল বৈধই নয়, বরং ফরজ। আত্মরক্ষা জিহাদের অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"

অর্থঃ “আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯০)

এই আয়াতটি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয় এবং একই সাথে সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করে, যা জিহাদের নৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি ইসলামের যুদ্ধনীতির ভিত্তি, যেখানে প্রতিরক্ষাই মূলনীতি এবং আক্রমণ কেবল প্রতিরোধের জন্যই অনুমোদিত। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও আত্মরক্ষার অধিকার একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত, যা ইসলামী শরিয়তের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

৫. দীনকে সমুন্নত করা

জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা এবং তাঁর কালিমাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে রয়েছে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১২৩)

ইমাম বুখারি (রহ.) এই হাদিসটিকে ‘কিতাবুল জিহাদ’-এর সূচনায় স্থান দিয়ে এর গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। এখানে ‘আল্লাহর কালিমা’ বলতে তাওহিদ, আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর বিধানকে বোঝানো হয়েছে। তবে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)

‘ফাতহুল বারি’-তে স্পষ্ট করে বলেন, ‘দ্বীনকে সমুন্নত’ করার অর্থ কখনোই জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ নয়; বরং ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষাকে অবাধে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ইসলামী সমাজে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত একে সমর্থন করে:

ط لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

অর্থঃ “দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।” (সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)।

৬. আত্মশুদ্ধি ও নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

জিহাদ শুধু বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে নয়; বরং এর একটি অপরিহার্য ও মৌলিক লক্ষ্য হলো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শত্রু—নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক পরিশুদ্ধির এই লড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: “প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।” (জামি‘ আত-তিরমিযি, হাদিস নং ১৬২১; সহিহ আবু দাউদ, হাদিস নং ১২৫৮)

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ‘ইহইয়া উলুমিদ্দিন’-এ বলেন, আত্মশুদ্ধিই সকল ইবাদতের প্রাণ এবং আত্মার জিহাদে সফল না হয়ে বাহ্যিক জিহাদে প্রকৃত সফলতা অর্জন অসম্ভব। ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.) নফসের জিহাদকে চারটি স্তরে বিভক্ত করে বলেন, এটি ব্যক্তির সত্য জানা, আমল করা, দাওয়াত দেওয়া এবং ধৈর্য ধারণের নিরন্তর সংগ্রাম, যা ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

৭. স্থায়ী শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা

জিহাদের চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো সমাজে ন্যায়ভিত্তিক স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম কখনোই অশান্তি, রক্তপাত বা ধ্বংসকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং যুদ্ধ একটি অস্থায়ী ও বাধ্যতামূলক অবস্থা, যার পরিসমাপ্তি ঘটে শান্তির মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থঃ “আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল-আনফাল, ৮:৬১)

ইমাম তাবারি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম শান্তিকেই প্রাধান্য দেয় এবং যুদ্ধ কেবল তখনই চালানো উচিত যখন শান্তির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা, ধ্বংস নয়; কারণ কুরআনের নির্দেশ হলো:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থঃ “আল্লাহ শান্তির দিকে আহ্বান করেন।” (সূরা ইউনুস, ১০:২৫)

সুতরাং, জিহাদের মূল লক্ষ্য হলো এমন এক ন্যায্যভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

জিহাদের মূলনীতি

ইসলামী শরিয়তে জিহাদ একটি সুসংহত, নিয়ন্ত্রিত ও নৈতিকতানির্ভর বিধান। এটি কখনোই স্বেচ্ছাচারী সহিংসতা, সন্ত্রাস বা উগ্রবাদের নামান্তর নয়; বরং এটি একটি পবিত্র দায়িত্ব, যা কতগুলো সুস্পষ্ট ও অলঙ্ঘনীয় মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও সুন্নাহর গভীর পর্যবেক্ষণে প্রতিভাত হয় যে, জিহাদের প্রতিটি স্তরে—আত্মিক সাধনা থেকে শুরু করে সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত—পাঁচটি মৌলিক নীতি সুদৃঢ়ভাবে বিদ্যমান:

১. আল্লাহভীতি (তাকওয়া)
২. ন্যায্যবিচার (আদল)
৩. সংযম (ইতিদাল)
৪. মানবতা (ইনসানিয়াত)

৫. শান্তি প্রতিষ্ঠা (সুলহ)

এই পঞ্চমূলনীতি জিহাদকে একটি মহৎ ইবাদতে পরিণত করেছে এবং একে আধুনিক সম্ভ্রাসবাদ ও বর্বরতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে। নিম্নে এই পাঁচটি মূলনীতির প্রতিটি কুরআন, হাদিস ও ফকিহগণের মতামতের আলোকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হলো—

১. আল্লাহভীতি (তাকওয়া)

আল্লাহভীতি বা তাকওয়া হলো জিহাদের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক মৌলিক নীতি। তাকওয়া অর্থ অন্তরে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করা। এর ব্যবহারিক অর্থ হলো—যুদ্ধাবস্থায় শত্রুর প্রতি আক্রোশবশত আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করা, গনিমতের মালে খিয়ানত না করা, চুক্তি ভঙ্গ না করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১০২)

জিহাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরও বলেন:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

অর্থঃ “আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত।” (সূরা আল-হজ, ২২:৭৮)

এখানে ‘যেভাবে জিহাদ করা উচিত’ বলতে তাকওয়া ও আল্লাহর আদেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকেই বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের সময় সেনাপতিদের প্রথম উপদেশই দিতেন তাকওয়া সম্পর্কে:

“তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৩১)

জিহাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর উপস্থিতি ও তাঁর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত রাখাই তাকওয়ার দাবি। তাকওয়াই যোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দানে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখে এবং বিজয়ের উল্লাসেও অহংকারী হতে দেয় না। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন, “যে জিহাদ তাকওয়া বিবর্জিত, তা কেবল ধ্বংস ও ফিতনা সৃষ্টি করে।”

২. ন্যায়বিচার (আদল)

ন্যায়বিচার বা ‘আদল’ জিহাদের দ্বিতীয় অপরিহার্য নীতি। ইসলামী দৃষ্টিতে জিহাদ কেবল তখনই বৈধ, যখন তা ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে যে, জিহাদ কখনোই আত্মসন, জুলুম বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার হাতিয়ারে পরিণত হবে না। শত্রুর প্রতি বিদ্বেষও যেন মুমিনকে ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত না করে, এ ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হও, ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে। আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনো সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।” (সূরা আল-মায়িদা, ৫:৮)

জিহাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থঃ “আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না; নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” (সূরা আল-বাকার, ২:১৯০)

৩. সংযম (ই‘তিদাল)

সংযম বা ‘ই‘তিদাল’ জিহাদের তৃতীয় মৌলিক নীতি, যার অর্থ হলো ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইসলাম উগ্রবাদ ও চরমপন্থাকে কখনোই সমর্থন করে না।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, “ইসলাম মধ্যপন্থার দ্বীন, এতে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কোনো স্থান নেই।”

জিহাদেও এই নীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রযোজ্য—যুদ্ধ যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ বা হিংস্র হওয়া যাবে না, তেমনি শত্রুর অন্যায়ের জবাবে নিজে অন্যায় করা যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মতকে ‘মধ্যপন্থী জাতি’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

অর্থঃ “আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো।” (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৪৩)

যুদ্ধের ময়দানে সংযম ও সীমালঙ্ঘন না করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ “তবে তারা যদি বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৯২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যেও মুজাহিদদের উগ্রতা পরিহার করতে বলতেন এবং হঠকারিতা বা বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করতেন, যা জিহাদের ময়দানে শৃঙ্খলা ও সংযমের মূল ভিত্তি।

৪. মানবতা (ইনসানিয়াত)

মানবতা বা ইনসানিয়াত জিহাদের চতুর্থ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ইসলাম যুদ্ধের মতো চরম পরিস্থিতিতেও মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়। জিহাদ কখনোই মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে আনে না; বরং শত্রুর প্রতিও মানবিক আচরণ করতে শিক্ষা দেয়। এই নীতি জিহাদকে বর্বরতা ও সন্ত্রাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনাই জিহাদের মানবিক নীতির সর্বোত্তম দলিল। তিনি বলেন:

“যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে; খিয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, নিহতদের লাশ বিকৃত করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৩১)

খলিফা আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় যে বিখ্যাত দশটি উপদেশ দিতেন, তা মানবতার এক চিরন্তন দলিল। তাতে স্পষ্ট বলা ছিল:

“কোনো নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না; ফলবান গাছ কাটবে না বা পোড়াবে না; ঘরবাড়ি ধ্বংস করবে না; এবং কেবল খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া গবাদিপশু জবাই করবে না।” (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ৯৪৬)

৫. শান্তি প্রতিষ্ঠা (সুলহ)

শান্তি ও সন্ধি প্রতিষ্ঠা জিহাদের পঞ্চম ও চূড়ান্ত মূলনীতি। ইসলামী দৃষ্টিতে যুদ্ধ কোনো স্থায়ী অবস্থা নয়; বরং এটি একটি বাধ্যতামূলক অস্থায়ী পরিস্থিতি, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো স্থায়ী শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণেই ইসলাম শত্রুপক্ষ শান্তির প্রস্তাব দিলে তা সাগ্রহে গ্রহণের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থঃ “আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল-আনফাল, ৮:৬১)

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে শান্তির (ইসলামের) মধ্যে প্রবেশ করো।” (সূরা আল-বাকারা, ২:২০৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধকে এড়িয়ে শান্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে গিয়ে বলেন:

“হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও শান্তি (আফিয়াত) প্রার্থনা করো।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৪২)

মক্কা বিজয়ের দিন কোনো প্রতিশোধ না নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছিল শান্তি ও ক্ষমার এই নীতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাস্তব উদাহরণ।

জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়?

ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় ‘ফরজে আইন’ (ফরদুল আইন) বলতে বোঝায় সেই বিধান, যা প্রতিটি দায়িত্বশীল (মুকাল্লাফ) মুসলিমের ওপর ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যিক এবং যা কিছু লোক আদায় করলে অপরের দায়িত্ব শেষ হয় না। জিহাদের বিধান মূলত ‘ফরজে কিফায়া’ (সামষ্টিক দায়িত্ব); অর্থাৎ মুসলিমদের কোনো একটি দল তা সম্পাদন করলে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। তবে ফকিহগণ একমত যে, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে কিফায়া থেকে ‘ফরজে আইন’-এ রূপান্তরিত হয় এবং তখন তা প্রতিটি সক্ষম মুসলিমের ওপর ব্যক্তিগত দায়িত্বে পরিণত হয়। কুরআন, সুন্নাহ ও ফকিহদের ইজমার (ঐক্যমত) আলোকে প্রধানত তিনটি পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে আইন হয়:

১. কাফের ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হলে,
২. কোনো মুসলিম ভূখণ্ড শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে, এবং
৩. রাষ্ট্রপ্রধানের সাধারণ আহ্বান বা নির্দেশ আসলে।

এই তিনটি পরিস্থিতির প্রতিটি সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ নিম্নরূপ—

১. কাফের ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হলে (যুদ্ধের ময়দানে)

যখন মুসলিম ও শত্রু বাহিনী সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি দণ্ডায়মান হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন সেই পরিস্থিতিতে জিহাদ প্রতিটি উপস্থিত সক্ষম মুসলিমের জন্য ফরজে আইনে পরিণত হয়। এ অবস্থায় কারও জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, যদি না তা রণকৌশলের অংশ হয়। এই বিধান কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ۝ ١٥ (وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ১৬

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে—তবে যুদ্ধকৌশল হিসেবে স্থান পরিবর্তন বা নিজ দলে যোগদানের জন্য ছাড়া—সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরবে এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!” (সূরা আল-আনফাল, ৮:১৫-১৬)

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, যখন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়, তখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রতিটি উপস্থিত মুসলিমের জন্য ফরজে আইন হয়ে যায় এবং সেখান থেকে পলায়ন কবিরাত গুনাহ। ইমাম কুরতুবি (রহ.) আরও ব্যাখ্যা করেন, এই ফরজিয়তের পেছনে যুক্তি হলো, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কেবল ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়; বরং তা সমগ্র বাহিনীর মনোবল ভেঙে পরাজয়ের কারণ হতে পারে। তাই এ অবস্থায় উপস্থিত ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় যুদ্ধ ছেড়ে যেতে পারে না। তবে শর্ত হলো, ব্যক্তি যুদ্ধ করতে শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে; অক্ষম ব্যক্তির জন্য এই ফরজিয়ত শিথিলযোগ্য।

২. কোনো মুসলিম ভূখণ্ড শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে (প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ)

যখন কোনো মুসলিম দেশ, শহর বা জনপদ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেই এলাকার অধিবাসীদের জন্য জিহাদ ফরজে আইনে পরিণত হয়। এটি ‘জিহাদুদ দিফা’ বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ নামে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে আক্রান্ত অঞ্চলের সক্ষম লোকদের জন্য এটি প্রথমত ব্যক্তিগত ফরজ। যদি তারা শত্রুকে প্রতিরোধ করতে দুর্বল বা অসমর্থ হয়, তখন পর্যায়ক্রমে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের জন্য, পর্যায়ক্রমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য সাহায্য করা ফরজ হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থঃ “আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না; নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” (সূরা আল-বাকার, ২:১৯০)

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন: “শত্রু যদি কোনো মুসলিম ভূখণ্ড আক্রমণ করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল মুসলিমের ওপর জিহাদ ফরজে আইন। আর তাদের সাহায্য যদি এক এলাকার লোকেরাই যথেষ্ট হয়, তাহলে অন্যদের ওপর থেকে সেই ফরজিয়ত রহিত হয়।” (তাফসিরে কুরতুবি)।

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) ‘আল-মুগনি’-তে এর স্তরক্রম ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রথমত আক্রান্ত শহরবাসীর ওপর এটি ফরজে আইন; যদি তারা দুর্বল হয়, তবে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের ওপর; এবং প্রয়োজন ও চরম সংকটে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

৩. রাষ্ট্রপ্রধানের (ওলিউল আমর) সাধারণ আহ্বান বা নির্দেশ আসলে

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ওলিউল আমর (রাষ্ট্রপ্রধান বা বৈধ শাসক) যদি কোনো প্রয়োজনে বা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ মুসলিম জনগণকে বা নির্দিষ্ট কোনো দলকে আহ্বান করেন, তখন সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাদের জন্য ফরজে আইনে পরিণত হয়। এটি আমীরের বা শাসকের আনুগত্যের একটি অংশ, যা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের (ওলিউল আমর)-এরও।” (সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ‘ফাতহুল বারি’-তে বলেন, জিহাদ মূলত ফরজে কিফায়া; কিন্তু ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যখন কাউকে নির্দিষ্টভাবে আহ্বান করেন বা সাধারণ ডাক দেন, তখন তার জন্য তা ফরজে আইনে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও মক্কা বিজয়ের পর বলেছিলেন:

“যখন তোমাদেরকে (রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য) বের হতে বলা হবে, তখন তোমরা বের হয়ে যেয়ো।” (সহিহ বুখারি)

তবে ফকিহগণ এই সাধারণ আহ্বানের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নির্ধারণ করেছেন। যথা:

- রাষ্ট্রপ্রধানের আহ্বান কোনো অন্যায় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে না হয়ে দীন, দেশ বা মানবতার সুরক্ষার মতো শরিয়তসম্মত বৈধ কারণে হতে হবে।
- যে ব্যক্তিকে আহ্বান করা হবে, তাকে অবশ্যই শারীরিকভাবে সক্ষম (অন্ধ, পঙ্গু বা গুরুতর অসুস্থ না) হতে হবে। (উল্লেখ্য, ফরজে আইনের এই স্তরে পিতা-মাতার অনুমতি বা সাধারণ পারিবারিক ওজরের কারণে ঘরে বসে থাকার সুযোগ থাকে না)।

জিহাদ কত হিজরিতে ফরজ হয়েছে?

ইসলামী শরিয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর বিধানসমূহের ক্রমবিকাশ বা ‘তাদাররুজ’ (تدرج)। কোনো বিধান একবারে পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ না হয়ে ধাপে ধাপে, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হয়েছে, যাতে মুমিনগণ মানসিক ও বাস্তবিকভাবে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রস্তুত হতে পারেন। জিহাদের বিধান, বিশেষত সশস্ত্র জিহাদ বা কিতাল, এই ক্রমবিকাশের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

১. মক্কী যুগ: ধৈর্য ও সংঘর্ষ পরিহারের নির্দেশ

মক্কী যুগে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু, দুর্বল ও নির্যাতিত অবস্থায় ছিলেন; এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি ধৈর্য ধারণ, ক্ষমা প্রদর্শন এবং সংঘর্ষ সম্পূর্ণরূপে পরিহারের নির্দেশ দেন। কুরআনের একাধিক আয়াতে এ নির্দেশনা সুস্পষ্ট:

• خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ .

অর্থ: “অতএব আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন,সৎকাজের নির্দেশ দিন, আর মূর্থদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।” (সূরা আল-আরাফ, ৭:১৯৯)।

• وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ .

অর্থ: “আর আপনি ধৈর্য ধার করুন এবং আপনার ধৈর্য তো কেবল আল্লাহরই সাহায্যে। আপনি তাদের (কাফেরদের) কর্মকলাপ ও অবাধ্যতার জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মনঃকষ্টে ভোগবেন না।” (সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৭)।

• وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থঃ "ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করুন সেই উত্তম পন্থার মাধ্যমে, যা সবচেয়ে ভালো। ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে যেন হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৪)।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, মক্কী যুগে মুসলিমদের প্রতি যুদ্ধের কোনো অনুমতি ছিল না; বরং তাদের প্রতি ধৈর্য ও ক্ষমার নির্দেশ ছিল। মুশরিকদের অত্যাচারে তারা রক্তাক্ত হয়েছেন, কিন্তু জিহাদের কোনো নির্দেশ ছিল না।

২. মদীনা জীবনের সূচনা: আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রথম অনুমতি

হিজরতের পর মদীনায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হলে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে আত্মরক্ষার অনুমতি ও পরে যুদ্ধ ফরজ হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে প্রথম যে আয়াত নাযিল হয়, তা হলো সূরা আল-হজ্জ-এর ৩৯ নং আয়াত, যা সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিসংক্রান্ত আয়াত:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلُمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থঃ “যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম।” (সূরা আল-হজ্জ, ২২:৩৯)।

ইমাম ইবনে আব্বাস (রা.), ইমাম মুজাহিদ (রহ.), আতা (রহ.) ও কাতাদাহ (রহ.)-এর মতে, এটি প্রথম আয়াত যা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, “অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতই সর্বপ্রথম যুদ্ধের বৈধতা প্রদান করেছে।” (তাফসিরে কুরতুবি)। এ আয়াতটি হিজরতের প্রথম বর্ষে, অর্থাৎ ১ম হিজরির শেষ দিকে বা ২য় হিজরির শুরুর দিকে নাযিল হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির)।

৩. ২য় হিজরি: সশস্ত্র জিহাদ (কিতাল) ফরজ হওয়া

হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে কুরাইশদের আক্রমণের আশঙ্কা এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহ তা‘আলা সশস্ত্র যুদ্ধ বা কিতালকে ফরজ করে দেন। এই ফরযিয়তের ভিত্তি হিসেবে যে আয়াতটি নাযিল হয়, তা হলো সূরা আল-বাকার-র ২১৬ নং আয়াত:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ“তোমাদের উপর যুদ্ধ (কিতাল) ফরজ করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন্দ করো, তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যা ভালোবাসো, তা-ই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।” (সূরা আল-বাকার, ২:২১৬)।

অধিকাংশ তাফসিরকারক ও ফকিহের মতে, এই আয়াতটি ২য় হিজরিতে (বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে) নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে সশস্ত্র জিহাদ (কিতাল) মুসলিমদের উপর ফরজ করা হয়। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, “এ আয়াতটি যুদ্ধ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম নির্দেশনা। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এটি ২য় হিজরিতে নাযিল হয়েছে।” (তাফসিরে ইবনে কাসির)। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, “এই আয়াতটি জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে মৌলিক ভিত্তি। এটি ২য় হিজরিতে নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমেই যুদ্ধ ফরজ হয়।” (তাফসিরে কুরতুবি)।

৪. যুদ্ধের নৈতিক সীমারেখা নির্ধারণ

জিহাদের এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে যুদ্ধের নীতি ও সীমারেখা স্পষ্ট করতে সূরা আল-বাকার-র ১৯০ নং আয়াতটি নাযিল হয়:

• وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো তাদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।”

এই আয়াতটি মুসলিমদের যুদ্ধের নৈতিক দিক নির্দেশনা দেয়, যা পরবর্তীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ওমরাতুল কাযার প্রেক্ষাপটে আত্মরক্ষার নীতিকে আরও সুসংহত করে।

সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি সুসংহত ও স্থায়ী বিধান প্রবর্তিত হয়।

জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা

জিহাদ সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও ফকিহদের সর্বসম্মত মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমকালীন বিশ্বে বিশেষত পশ্চিমা গণমাধ্যম, ইসলাম বিদ্বৈষী গোষ্ঠী এবং কিছু উগ্রবাদী চক্রের অপতৎপরতার ফলে জিহাদ সম্পর্কে অজস্র ভুল ধারণা ও কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে ইসলাম-বিদ্বৈষীরা জিহাদকে সন্ত্রাসের প্রতিশব্দে পরিণত করেছে, অন্যদিকে কিছু বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ইসলামের নামে জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে নিরপরাধ মানুষের রক্তপাতকে বৈধতা দিতে চেয়েছে। উভয় ধারাই কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত। সংক্ষেপে কয়েকটি প্রচলিত ভুল ধারণা নিচে দেওয়া হলো—

১. প্রথম ভুল ধারণা: জিহাদ মানেই শুধু সশস্ত্র যুদ্ধ

সর্বাধিক প্রচলিত ভুল ধারণাটি হলো, জিহাদ বলতে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বা রক্তপাতকেই বোঝায়। অনেকেই মনে করেন, জিহাদ একমাত্র রণক্ষেত্রের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বাস্তবে জিহাদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। আরবি ভাষায় জিহাদ শব্দের অর্থ হলো ‘সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো’ বা ‘সাধ্যমতো সাধনা করা’। ইসলামি শরিয়তে জিহাদের একটি প্রধানতম প্রকার হলো ‘জিহাদুন্নফস’ বা নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। একটি সহিহ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

অর্থঃ “প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।” (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৮৬২)।

তাছাড়া জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত মতবাদ দূর করা (জিহাদ বিল ইলম), বাক্য ও কলমের দ্বারা সত্য প্রচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা (জিহাদ বিল লিসান), এবং সমাজের অসহায়, বিধবা ও মিসকিনদের সেবা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা.) বলেন:

“যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকিনদের (সাহায্যের) জন্য প্রচেষ্টা চালায়, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬০০৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯৮২)।

সশস্ত্র জিহাদ এই বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের একটি অংশমাত্র, যা বিশেষ শর্ত ও পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়া (রহ.) জিহাদের বহুমাত্রিকতা প্রমাণ করে একে চার ভাগে (নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, কাফেরদের বিরুদ্ধে ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে) এবং তেরোটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। সুতরাং, জিহাদকে কেবল যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিকৃতি।

২. দ্বিতীয় ভুল ধারণা: নিরপরাধ মানুষ হত্যা করাই জিহাদ

কোনো কোনো মহল জিহাদকে নির্বিচার গণহত্যা ও নিরপরাধ মানুষ হত্যার বৈধতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। আধুনিক উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো এই ভ্রান্ত ধারণাকে পুঁজি করে তাদের অপরাধমূলক কার্যক্রমকে জিহাদ নামে চালিয়ে থাকে। ইসলাম কখনোই নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে না; বরং একে চরমতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। কুরআনের নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থঃ “যে কেউ কাউকে হত্যা করল—হত্যার বদলা বা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া—সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে কেউ কাউকে বাঁচাল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাল।” (সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩২)।

সশস্ত্র জিহাদের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত কঠোর যুদ্ধনীতি নির্ধারণ করেছেন। তিনি সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় নির্দেশ দিতেন:

“যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে... বিশ্বাসঘাতকতা করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, অঙ্গহানি করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৩১)।

খলিফা আবু বকর (রা.) সেনাপতিদের যে বিখ্যাত দশটি উপদেশ দিতেন, তাতে সুস্পষ্টভাবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, নিরস্ত্র কৃষক এবং উপাসনালয়ের ধর্মযাজক বা সন্ন্যাসীদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ৯৪৬)। ইসলামী আইনে যুদ্ধের সময়ও যুদ্ধবন্দি, আহত ও বেসামরিক নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষিত। ইমাম নববি (রহ.) বলেন:

“নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং উপাসনালয়ের সন্ন্যাসীদের হত্যা করা হারাম, যদি না তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।”

সুতরাং, নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে জিহাদ মনে করা ইসলামের শিক্ষার সরাসরি লঙ্ঘন এবং এটি একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি।

৩. তৃতীয় ভুল ধারণা: ব্যক্তিগত রাগ বা প্রতিশোধের জন্য যুদ্ধ করাই জিহাদ

অনেকেই মনে করেন, ব্যক্তিগত শত্রুতা, গোত্রগত প্রতিহিংসা, আক্রোশ বা পার্শ্বিক কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাটাও জিহাদের অংশ। ইসলামী শরিয়তে জিহাদের মূল শর্তই হলো নিয়ত বা উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা। জিহাদ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীনের সুরক্ষার উদ্দেশ্যেই হতে পারে, ব্যক্তিগত ক্রোধ বা পার্শ্বিক স্বার্থে নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, “এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, আরেকজন যুদ্ধ করে গোত্রীয় গৌরবের জন্য, আরেকজন যুদ্ধ করে লোক দেখানোর জন্য; এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে?” তিনি উত্তর দিলেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই কেবল আল্লাহর পথে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১২৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯০৪)।

ইমাম নববি (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও সুরক্ষিত করা; ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নয়। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ‘ইহইয়া উলুমিদ্দিন’-এ বলেন, “যে যুদ্ধ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু জন্য হয়, তা জিহাদ নয়; বরং তা গুনাহ।” সুতরাং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যুদ্ধ করা জিহাদের পরিপন্থী এবং তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৪. চতুর্থ ভুল ধারণা: শাসক বা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব ছাড়া যে কেউ জিহাদ ঘোষণা করতে পারে

আধুনিক যুগের একটি মারাত্মক ভুল ধারণা হলো, যেকোনো ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছামতো জিহাদ ঘোষণা করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে। ইসলামী শরিয়তে সাধারণ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র আক্রমণাত্মক জিহাদ একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, যা কেবলমাত্র বৈধ রাষ্ট্রপ্রধান বা ‘ওলিউল আমর’-এর নির্দেশ ও নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে। ব্যক্তি বা বেসরকারি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে স্বঘোষিতভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ বা সহিংসতা শুরু করা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং তা ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) হিসেবে গণ্য। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের মধ্যকার উলিল আমার বা দায়িত্বশীলদের।” (সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯)।

ইসলামী ফিকহের সর্বসম্মত নীতি হলো, সাধারণ যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কেবল রাষ্ট্রের। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) তাঁর বিখ্যাত ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে লিখেছেন:

“জিহাদের বিষয়টি সুলতান বা শাসকের ওপর ন্যস্ত, তাঁর অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া কেউ (আক্রমণাত্মক) যুদ্ধে বের হবে না।”

অবশ্য কোনো মুসলিম দেশ হঠাৎ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ (জিহাদে দেফা) তাৎক্ষণিকভাবে সবার ওপর ফরজ হয়ে যায়। তবে বর্তমানে কোনো শান্তিময় দেশে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী যদি রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত সশস্ত্র সহিংসতায় লিপ্ত হয়, তবে তা জিহাদ নয়; বরং তা ফাসাদ (নৈরাজ্য) ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য হবে।

৫. পঞ্চম ভুল ধারণা: জোরপূর্বক মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করানো জিহাদের উদ্দেশ্য

ইসলামের সমালোচকদের একটি পুরোনো অভিযোগ হলো, জিহাদের উদ্দেশ্য নাকি তরবারির জোরে অমুসলিমদের ইসলামে দীক্ষিত করা। কেউ কেউ ‘তরবারির ধর্ম’ বলে ইসলামকে কটাক্ষ করে থাকে। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা খণ্ডিত একটি অভিযোগ। কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ “দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।” (সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)।

এই আয়াতটি ইসলামের ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতির মূল ভিত্তি। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কাউকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হবে না; কারণ ইসলামের সত্যতা ও প্রমাণ এতটাই সুস্পষ্ট যে, জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন নেই। ঐতিহাসিকভাবেও দেখা যায়, ইসলামী শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকগণ (জিম্মি) জিজয়া করের বিনিময়ে জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং পরবর্তী খলিফাগণ বিজিত অঞ্চলের খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ধর্মীয়

স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন। জিহাদের উদ্দেশ্য কখনোই জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ ছিল না; বরং তা ছিল অত্যাচারী শক্তির জুলুম দূর করা এবং সব ধর্মের মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

৬. ষষ্ঠ ভুল ধারণা: জিহাদ মানেই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা

অনেকে জিহাদকে সমাজে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে চিত্রিত করে। জিহাদ যেন ধ্বংস ও অরাজকতারই নামান্তর — এমন ধারণা বহুল প্রচারিত। প্রকৃত জিহাদের উদ্দেশ্য হলো জুলুম দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, ফিতনা-ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি করা নয়। কুরআনে আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“আর যখন সে ফিরে যায়, তখন সে জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং শস্যক্ষেত্র ও জান-মাল ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। আর আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।” (সূরা আল-বাকারা, ২:২০৫)।

সশস্ত্র জিহাদের ক্ষেত্রেও ফসল, গাছপালা, প্রাণী ও স্থাপনা ধ্বংস করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, যেমনটি আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশনায় স্পষ্ট। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, “যুদ্ধের সময় ফসল, গাছ ও স্থাপনা ধ্বংস করা বৈধ নয়, যদি না একান্ত প্রয়োজন হয়।”

ইসলামের শিক্ষা হলো, জিহাদ এমন একটি নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া, যা সমাজ থেকে ফিতনা, ফাসাদ ও অত্যাচার দূর করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অর্থঃ “আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৩)।

অর্থাৎ, জিহাদের লক্ষ্যই হলো বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনা।

৭. সপ্তম ভুল ধারণা: সশস্ত্র যুদ্ধই একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ

অনেকেই মনে করেন, সশস্ত্র জিহাদই হলো ইসলামের একমাত্র বা সবসময় পালনীয় শ্রেষ্ঠতম জিহাদ এবং আত্মশুদ্ধি বা আমলের কোনো মূল্য এর চেয়ে বেশি নয়। ইসলামে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং সমাজ সংস্কারের কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন:

“প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।” (সহিহ ইবনে হিব্বান)।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন, ভেতরের আত্মার জিহাদে (কুপ্রবৃত্তি দমনে) সফল না হয়ে কোনো ব্যক্তি বাইরের জিহাদে প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারে না। ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.)-এর মতে, নফসের জিহাদই হলো অন্য সব প্রকার জিহাদের মূল ভিত্তি ও পূর্বশর্ত। সুতরাং, আত্মশুদ্ধি, নৈতিক চরিত্র গঠন, ইলম অর্জন ও প্রচার এবং সমাজসেবাকে উপেক্ষা করে শুধু অস্ত্রধারণকেই একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ মনে করা একটি গুরুতর ভুল ধারণা।

কুরআনুল কারিমে জিহাদের গুরুত্ব

কুরআনুল কারিমে জিহাদকে ঈমানদারদের অন্যতম মহান আমল এবং আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কুরআনে জিহাদ ও তার সমগোত্রীয় শব্দ প্রায় ৪১ বার বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, যা এর গুরুত্ব ও ব্যাপ্তির সুস্পষ্ট নির্দেশক। কুরআনের পরিভাষায় জিহাদ কেবল সশস্ত্র সংগ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আত্মিক, আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক সকল প্রকার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার সমষ্টিগত রূপ। নিচে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক আয়াত ও তার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করা হল:

১. মাল ও জান দ্বারা জিহাদ: সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থঃ “যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করেছে, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অনেক বড়। আর তারাই তো সফলকাম।” (সূরা আত-তাওবা, ৯:২০)।

- **বিশ্লেষণ:** এই আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তিনটি গুণের অধিকারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন: ঈমান, হিজরত এবং মাল ও জান দ্বারা জিহাদ।
- **মুফাসসিরদের মতামত:** ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, জিহাদ মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধির একটি প্রধান মাধ্যম। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এখানে ‘মাল ও জান’ দ্বারা জিহাদ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, মুমিন তার সর্বোচ্চ সম্পদ—জীবন ও ধন-সম্পদ—আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে, যা তার ঈমানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

২. আল্লাহর সাথে বেচাকেনার চুক্তি: জান্নাতের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ্ তা‘আলা আরও ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন; এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। এটি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তাঁর উপর ন্যস্ত সত্য প্রতিশ্রুতি...” (সূরা আত-তাওবা, ৯:১১১)।

- **বিশ্লেষণ:** এই আয়াতটি জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলতের ক্ষেত্রে এক অনন্য দলিল। এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা মুমিনদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে ‘ক্রয়’ করার কথা বলেছেন।
- **মুফাসসিরদের মতামত:** ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতে ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ এবং বিক্রেতা হলো মুমিনগণ; পণ্য হলো তাদের জান-মাল এবং মূল্য হলো চিরস্থায়ী জান্নাত। ‘তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে’ এই প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকার অর্থ হলো, জিহাদের এই বিধান ও ফজিলত সকল আসমানি কিতাবেই বিদ্যমান ছিল।

৩. জিহাদ: ঈমানের দাবি ও সত্যনিষ্ঠার মানদণ্ড

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অর্থঃ “তারাই তো প্রকৃত মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর সংশয় পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। বস্তুত এরাই সত্যনিষ্ঠ।” (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৫)।

- **বিশ্লেষণ:** এই আয়াতটি জিহাদকে ঈমানের অপরিহার্য দাবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
- **মুফাসসিরদের মতামত:** ইমাম তাবারি (রহ.) বলেন, আয়াতটি সুস্পষ্ট করেছে যে, যারা জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে না, তারা নিজেদের ঈমানের দাবি পূর্ণ করে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, জিহাদ ঈমানের বহিঃপ্রকাশ এবং প্রকৃত মুমিনের পরিচায়ক।

৪. জিহাদ: আল্লাহর প্রিয়তম আমল (অন্যান্য ইবাদতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব)

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

أَجْعَلْتُكُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ “তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে তাদের সমতুল্য মনে করো, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? আল্লাহর নিকট এরা সমতুল্য নয়...” (সূরা আত-তাওবা, ৯:১৯)।

- **বিশ্লেষণ:** এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা জিহাদকে হজের খেদমত ও মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণের মতো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতের চেয়েও উচ্চতর স্থান দিয়েছেন।
- **মুফাসসিরদের মতামত:** ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদ ইসলামের এমন একটি আমল, যা অন্যান্য অনেক ইবাদতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি সেই সময়ে নাযিল হয় যখন কিছু মানুষ হাজীদের সেবা ও কাবা শরিফের রক্ষণাবেক্ষণকে ঈমান ও জিহাদের চেয়েও বড় মনে করত; আল্লাহ তাদের ভুল ভেঙে দিয়ে জিহাদের প্রকৃত মর্যাদা সুস্পষ্ট করেন।

কুরআনুল কারিমে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

কুরআনুল কারিমের আলোকে জিহাদ মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অপরিহার্য বিধান, যার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত। নিম্নে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত কুরআনি নির্দেশনাগুলো আলোচনা হলো:

১. আত্মরক্ষা ও নিপীড়িত মানবতার উদ্ধার

জিহাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয়তা হলো আত্মরক্ষা এবং নির্যাতিত, অসহায় মানুষকে জুলুমের কবল থেকে উদ্ধার করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

অর্থঃ “আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করছ না, যারা বলে ওঠে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ অত্যাচারী লোকদের শহর থেকে বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক পাঠাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাও’।” (সূরা আন-নিসা, ৪:৭৫)।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি মুসলিমদের জন্য একটি তিরস্কারমূলক আহ্বান, যাতে তারা নিপীড়িতদের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ইমাম

কুরতুবি (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, জিহাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো অত্যাচার দূর করা এবং দুর্বলের পাশে দাঁড়ানো। এটি জিহাদের মানবিক প্রয়োজনীয়তাকেই নির্দেশ করে। আধুনিক ফকিহ শাইখ ইউসুফ আল-কারদাভি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি জিহাদের সার্বজনীন মানবিক ভিত্তি স্থাপন করে, যা কেবল মুসলিম নয়, সকল নির্যাতিত মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

২. ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল

ইসলামী সমাজে ফিতনা (ধর্মীয় নিপীড়ন, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য) হত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। জিহাদের মাধ্যমে এই ফিতনা নির্মূল করা একটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা। আল্লাহ বলেন:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থঃ “আর ফিতনা হত্যার চেয়েও কঠিনতর।” (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অর্থঃ “আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৩)।

ইমাম তাবারি (রহ.) বলেন, এখানে ‘ফিতনা’ বলতে কুফর, শিরক, ধর্মীয় নিপীড়ন ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, জিহাদের মাধ্যমে ফিতনা নির্মূল করে সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। এটি জিহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার অন্যতম ভিত্তি।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও দ্বীনের সুরক্ষা

জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দ্বীনকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখার অপরিহার্য মাধ্যম। আল্লাহ বলেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থঃ “তোমাদের জন্য জিহাদ ফরয করা হলো, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন্দ করো, তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যা ভালোবাসো, তা-ই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।” (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১৬)।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি জিহাদের ফরযিয়ত সম্পর্কে মৌলিক দলিল। এখানে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জিহাদ যদিও স্বভাবতই মানুষের কাছে কষ্টকর ও অপছন্দনীয়, তবুও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ব্যক্তি ও জাতির জন্য বিরাট কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, জিহাদের প্রয়োজনীয়তা এখানেই যে, এর মাধ্যমে দীন, সমাজ ও রাষ্ট্র সুরক্ষিত থাকে। যদি জিহাদ না থাকত, তাহলে বাতিল শক্তি সমাজে প্রভাব বিস্তার করত এবং দ্বীনের ওপর আঘাত আসতো।

৪. আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ ও ধৈর্যের পরীক্ষা

জিহাদ কেবল বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়; বরং এটি ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি, ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সৃষ্টির একটি অপরিহার্য মাধ্যম। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

অর্থঃ “আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।” (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:৩১)।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, জিহাদ মুমিনের ঈমানের সত্যতা যাচাইয়ের একটি মাধ্যম। জিহাদ মুমিনের মাঝে ত্যাগ, ধৈর্য, সাহস এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সৃষ্টি করে। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন, জিহাদের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে, যা ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠনে অপরিহার্য।

৫. ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

জিহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হলো, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং মানুষকে জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের হাত থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ্ বলেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

অর্থঃ “দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।” (সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)।

এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই প্রয়োজনে জিহাদ বৈধ, যা মানুষকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের ফিতনা থেকে মুক্তি দেয়।

হাদিস শরিফের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব, মর্যাদা ও ফজিলত

হাদিস শরিফ ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস, যা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, সম্পূরক ও বাস্তব প্রয়োগের মূর্তরূপ। হাদিসের ভাষ্যে জিহাদকে এমন এক মহান ইবাদত হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা জান্নাত লাভের বিশেষ মাধ্যম, দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর নিকট অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। হাদিস শরিফের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কিত নির্বাচিত হাদিসগুলোর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো-

১. জিহাদের মর্যাদা: জান্নাতে বিশেষ দরজার সুসংবাদ

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহাদের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন:

“জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম ‘বাবুল জিহাদ’। আল্লাহ তা‘আলা এ দরজা দিয়ে মুজাহিদদের প্রবেশ করাবেন।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৮৯৭ ; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০২৭)।

এই হাদিসটি জিহাদের মর্যাদার ক্ষেত্রে এক অনন্য দলিল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ‘ফাতহুল বারি’-তে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতে বিভিন্ন ইবাদতের জন্য বিশেষ দরজা রয়েছে—যেমন ‘বাবুস সালাত’ (নামাজের দরজা), ‘বাবুর রাইয়্যান’ (রোজাদারদের দরজা), ‘বাবুস সাদাকাহ’ (দানশীলদের দরজা) ইত্যাদি। ‘বাবুল জিহাদ’ সেই বিশেষ দরজাগুলোর অন্যতম, যা থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদ এমন এক স্বতন্ত্র ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইবাদত, যার জন্য জান্নাতে একটি আলাদা প্রবেশপথ নির্ধারিত হয়েছে। ইমাম নববি (রহ.) বলেন, এই হাদিস জিহাদের ফজিলত ও মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ, কেননা জান্নাতে বিশেষ দরজা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর জন্যই নির্ধারিত। হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) বলেন, ‘বাবুল

জিহাদ' দিয়ে কেবল তারাই প্রবেশ করবে, যারা বিশুদ্ধ নিয়তে একমাত্র আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করেছে; পার্থিব স্বার্থ বা খ্যাতির জন্য যুদ্ধকারীগণ এ সুযোগ পাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন,

“জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন; প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৭৯০)।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এই হাদিস জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও বিশেষ মর্যাদার প্রমাণ। জান্নাতে এই একশত স্তরের সর্বোচ্চটি হলো ‘জান্নাতুল ফিরদাউস’, যার ওপরেই রয়েছে আরশে রহমান। ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এই স্তরগুলো একমাত্র জিহাদকারীদের জন্যই নির্ধারিত, যা জিহাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা নির্দেশ করে।

২.জিহাদের ফজিলত: দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

“একদিন ও একরাত রিবাত (সীমান্ত পাহারা দেওয়া) একমাস সিয়াম পালন ও একমাস কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) থেকে উত্তম।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯১৩)।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, এই হাদিস জিহাদের ধারাবাহিকতা ও প্রস্তুতির ফজিলতের অনন্য নজির। সীমান্ত প্রহরা একটি ধারাবাহিক ইবাদত, যা মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করে আরও বলেন:

“আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৭৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮৮০)।

এই হাদিসটি জিহাদের ফজিলতের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে নির্দেশ করে। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ‘ফাতহুল বারি’-তে বলেন, এখানে ‘এক সকাল বা এক বিকাল’ দ্বারা অল্প সময়কেও বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর পথে সামান্য সময় ব্যয় করাও যদি সমগ্র দুনিয়া ও তার সবকিছু থেকে উত্তম হয়, তাহলে এর চেয়ে বেশি সময়ের মর্যাদা কত হবে, তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম নববি (রহ.) বলেন, এই হাদিস জিহাদের মাহাত্ম্য ও ফজিলতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, দুনিয়ার সকল সম্পদ,

ধন-দৌলত, ক্ষমতা ও ভোগ-বিলাসের চেয়েও আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয়িত সামান্য সময় অধিক মূল্যবান। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এর কারণ হলো, দুনিয়া ও তার সবকিছু ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী; পক্ষান্তরে জিহাদের প্রতিদান চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত। শাইখ ইউসুফ আল-কারদাভি (রহ.) বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে যে, জিহাদ কেবল একটি সামরিক কর্মকাণ্ড নয়; বরং তা এমন এক ইবাদত, যা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণকে ধারণ করে।

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকেও গুরুত্ব দিয়ে বলেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল অথবা জিহাদের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করল, সে মহান মর্যাদা লাভ করল।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯১০; জামি‘ আত-তিরমিযি, হাদিস নং ১৬২১)।

এই হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রমাণ করে যে, জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ ব্যক্তিও যদি অন্তরে জিহাদের প্রতি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প পোষণ করে, তবে সেও জিহাদের মর্যাদা ও সওয়াব লাভ করতে পারে। ইমাম নববি (রহ.) ‘আল-মিনহাজ’-এ বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে যে, নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই ইবাদতের প্রাণ; শারীরিকভাবে অক্ষম হলেও আন্তরিক সংকল্পের কারণে আল্লাহ বান্দাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেন, এই হাদিসটি সেইসব লোকের জন্য সুসংবাদ, যারা সত্যিকার অর্থে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা রাখে কিন্তু বৈধ ওজরের কারণে অংশ নিতে পারে না। পাশাপাশি, যারা জিহাদ করে না এবং অন্তরেও জিহাদের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, তাদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। রাসূল (সা.) বলেন,

“যে ব্যক্তি জিহাদ না করে অথবা অন্তরে জিহাদের সংকল্পও পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করল, সে মুনাফিকির একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯১০)।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এটি জিহাদের গুরুত্ব ও ফরযিয়তের প্রতি অকাট্য ইঙ্গিত।

৪. সর্বোত্তম জিহাদ: জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা নির্দেশ করে বলেন:

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।” (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪; জামি‘ আত-তিরমিযি, হাদিস নং ২১৭৪; সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০১১)।

ইমাম তিরমিযি (রহ.) এই হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। ইমাম আলবানি (রহ.) একে ‘সহিহ’ বলেছেন। এই হাদিসটি জিহাদের ধারণাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায় এবং প্রমাণ করে যে, জিহাদ কেবল অস্ত্রধারণ নয়; বরং সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার হওয়াও জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ—বরং সর্বোত্তম জিহাদ। ইমাম খাত্তাবি (রহ.) বলেন, জালিম শাসকের সামনে সত্য বলাকে ‘সর্বোত্তম জিহাদ’ বলার কারণ হলো, এতে রয়েছে চরম ঝুঁকি—নিজের জান, মাল ও পদমর্যাদা হারানোর ভয়। তবু যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে সত্য বলে, সে প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বড় জিহাদে লিপ্ত হয়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, জিহাদ বিল লিসান (বাক্যের জিহাদ) অনেক ক্ষেত্রে জিহাদ বিস সাইফ (সশস্ত্র জিহাদ)-এর চেয়েও অধিক মর্যাদার, কারণ এতে আত্মসংযম, সাহস ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রয়োজন হয়। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ‘ইহইয়া উলুমিদ্দিন’-এ বলেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য বলা নফসের জিহাদেরই একটি অংশ, কারণ এতে আত্মার কুপ্রবৃত্তি ভয়, লোভ ও আত্মরক্ষার তাড়না দমন করতে হয়।

৫. জিহাদের বহুমাত্রিকতা: মানব সেবা ও পারিবারিক দায়িত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহাদের পরিধিকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও সম্প্রসারিত করেছেন এবং মানব সেবা ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনকে জিহাদের সমতুল্য মর্যাদা দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন,

“যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকিনদের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬০০৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৩৭৩)।

ইমাম নববি (রহ.) বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে যে, সমাজের দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির সেবা করাও একটি পবিত্র জিহাদ, যা সশস্ত্র জিহাদের সমতুল্য সওয়াবের কারণ হয়। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন?” উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বললে রাসূল (সা.) বলেন,

“তবে তুমি ফিরে যাও এবং তাঁদের সেবার মাধ্যমে জিহাদ করো।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩০০৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৩৯৮)।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার সেবা সশস্ত্র জিহাদের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন পিতা-মাতা সন্তানের সেবার মুখাপেক্ষী হন।

৬.জিহাদ: ইসলামের সুউচ্চ শিখর

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহাদকে দীনের কাঠামোতে সর্বোচ্চ অবস্থানে স্থাপন করে বলেন:

“এই বিষয়ের (ইসলামের) মূল ভিত্তি হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো সালাত এবং এর সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ।” (জামি‘ আত-তিরমিযি, হাদিস নং ২৬১৬; সহিহ ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৭৩)।

ইমাম তিরমিযি (রহ.) এই হাদিসটিকে ‘হাসান সহিহ’ বলেছেন। ইমাম মুবারকপুরি (রহ.) ‘তুহফাতুল আহওয়াযি’-তে বলেন, এ হাদিসে রাসূল (সা.) ইসলামের কাঠামোকে একটি শিবির বা তাঁবুর সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে ইসলাম হলো ভিত্তি, সালাত হলো খুঁটি বা স্তম্ভ এবং জিহাদ হলো তার সর্বোচ্চ চূড়া। এই রূপ থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদ ছাড়া ইসলামী কাঠামো পূর্ণতা পায় না। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, জিহাদকে ‘চূড়া’ বলার কারণ হলো, এর মাধ্যমেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি ও মর্যাদা প্রকাশিত হয়।

হাদিসের এই শিক্ষাসমূহ প্রমাণ করে যে, জিহাদ কোনো সংকীর্ণ মতবাদ নয়; বরং তা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক সার্বজনীন ও পবিত্র সংগ্রামের নাম। একজন মুমিনের কর্তব্য হলো, জিহাদের এই বহুমাত্রিক গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করে নিজের সামর্থ্য ও অবস্থান অনুযায়ী জীবনকে এই পবিত্র সংগ্রামে উৎসর্গ করা এবং সেই সঙ্গে জিহাদ সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ভ্রান্ত ধারণাসমূহ নিরসনে কুরআন ও সহিহ হাদিসের সঠিক জ্ঞান প্রচার করা।

জিহাদের এক অনন্য উদাহরণ

বদরের অপমানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা ৩,০০০ সুসজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। এর নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। রাসূল (সাঃ) মদিনা অভ্যন্তরে থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীর (বিশেষ করে বদরে অংশগ্রহণ না করা তরুণদের) উৎসাহে বাইরে গিয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। ১,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি উহুদ প্রান্তরে গমন করেন, কিন্তু পথে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ সৈন্য নিয়ে সরে দাঁড়ায়। ফলে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০০।

রাসুল (সাঃ) উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে বাহিনী দাঁড় করান, যেন পেছন থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে।

পেছনের নিরাপত্তার জন্য পাহাড়ের একটি গিরিপথে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-এর নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে মোতায়েন করেন। তাদের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল:

"তোমরা আমাদের পেছন দিক রক্ষা করবে। যদি দেখো আমরা পরাজিত হচ্ছি, তবুও আমাদের সাহায্যে আসবে না। আর যদি দেখো আমরা জয়ী হয়ে গনিমত কুড়াচ্ছি, তবুও অংশ নিতে আসবে না। তোমরা নিজ অবস্থানে অটল থাকবে।" (সহিহ বুখারি) যুদ্ধের শুরুতে মুসলিম বাহিনী প্রবল পরাক্রমে কুরাইশদের পরাজিত করতে থাকে এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করে। জয় যখন প্রায় নিশ্চিত এবং গনিমতের মাল কুড়ানো শুরু হয়, তখন রাসুল (সাঃ)-এর কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও জাবালে রুমাতের অধিকাংশ তীরন্দাজ (প্রায় ৪০ জন) গিরিপথ ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। তারা ভেবেছিলেন যুদ্ধ শেষ। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং মাত্র ১০ জনসহ অবস্থান ধরে রাখেন। কুরাইশ বাহিনীর অশ্বারোহী কমান্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদ সুযোগ বুঝে পেছন থেকে গিরিপথ দিয়ে আক্রমণ করেন। পেছন থেকে এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে মুসলিম বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। "মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন" গুজবে মুসলিমদের মনোবল ভেঙে পড়ে এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে মাত্র কয়েকজন সাহাবী (যেমন তালহা, সা'দ, আবু দুজানা) রাসুল (সাঃ)-কে ঘিরে মানব ঢাল তৈরি করেন। তিনি গুরুতর আহত হন (দাঁত ভাঙে, মুখমণ্ডল কেটে যায়) কিন্তু তবুও ধৈর্য ধরে বাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত করে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যান। এখানেই তাঁর সামরিক নেতৃত্বের চরম পরীক্ষা হয়।

এই যুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, উহুদ যুদ্ধ শেখায় যে, জিহাদে নেতৃত্বের আনুগত্য ও শৃঙ্খলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ; সামান্য অবহেলাও বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ইসলামী সমাজে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ভূমিকা

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর এই মহান লক্ষ্য অর্জনে 'জিহাদ' বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ইসলামে জিহাদ বলতে শুধু সশস্ত্র যুদ্ধকে বোঝায় না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমাজে বিদ্যমান অন্যায়, জুলুম, বৈষম্য, শোষণ ও ফিতনার বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানবসমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও কোরআনের নির্দেশনা

ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করতে চায় যেখানে ধনী-গরিব, শাসক-প্রজা, সাদা-কালো সকল মানুষ সমান মর্যাদা পাবে। কিন্তু যখন সমাজে জুলুম, অত্যাচার, দুর্নীতি ও মানুষের অধিকার হরণ শুরু হয়, তখন জিহাদ সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঢাল হিসেবে কাজ করে।

ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়।" (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

২. জুলুম ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠন

সামাজিক ন্যায়ের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো সমাজকে জুলুম ও শোষণমুক্ত করা। যখন কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করে, তখন সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া জিহাদের অংশ। রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকে 'সর্বোত্তম জিহাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

জালেমকে বাধা দেওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন:

"তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! মজলুমকে তো সাহায্য করব, কিন্তু জালেমকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, "তার হাত ধরে তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে (এটাই তাকে সাহায্য করা)।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৪৪৪)

৩. মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিতকরণ

একটি আদর্শ সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা বংশমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।

- **অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো:** সমাজে যখন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো খর্ব হয়, তখন গরিব ও অসহায় মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো এবং তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।
- **অর্থনৈতিক জিহাদ:** ইসলামী সমাজে পুঁজিপতিদের একচেটিয়া আধিপত্য দূর করতে অর্থনৈতিক জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মাঝেই কুক্ষিগত না হয়, সেজন্য ধনী ব্যক্তিরা যাতে জাকাত ও সদকা সঠিকভাবে আদায় করে এবং দরিদ্রদের পুনর্বাসন করা যায়, তার সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টাই হলো আর্থিক জিহাদ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অর্থ: "যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)

৪. বর্ণ ও বংশীয় বৈষম্যের অবসান

সমাজের বর্ণ, গোত্র ও বংশীয় বৈষম্য দূরীকরণেও জিহাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। জাহেলি যুগের কুসংস্কার দূর করে মানুষের সততা ও 'তাকওয়া' বা খোদাভীতিকে মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার যে সামাজিক সংগ্রাম, তা ইসলামের অন্যতম বড় আদর্শ।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এমন অপরাধে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে না। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা আল-মায়দাহ: ৮)

৫. আইনের শাসন ও আইনি সাম্য

সামাজিক ন্যায়ের মূল ভিত্তি হলো আইনের চোখে সবাই সমান হওয়া—তা সে রাষ্ট্রের প্রধান হোক কিংবা সাধারণ কোনো নাগরিক। সমাজে এই আইনি সাম্য ও সুশাসন বজায় রাখার জন্য:

- সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করা।
- বিচার বিভাগকে সব ধরনের প্রভাবমুক্ত রাখা।
- যেকোনো মূল্যে সামাজিক ইনসাফ নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী সমাজে জিহাদ কোনো ধ্বংসাত্মক পথ নয়, বরং এটি একটি সংস্কারমূলক প্রক্রিয়া। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের অসঙ্গতি ও বৈষম্য দূর করা, মানুষের ভেতর থেকে অহংকার ও হীনমন্যতা মুছে ফেলা এবং সামাজিকভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ (আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার) নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমেই কেবল একটি শান্তিপূর্ণ, বৈষম্যহীন ও আদর্শ সাম্যের সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

কুরআনের আলোকে শহীদের মর্যাদা ও পুরস্কার

শহীদগণ ইসলামী জীবনাদর্শে এক অনন্য ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা শহীদদেরকে বিশেষ সম্মান, ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. শহীদ ‘মৃত’ নন, বরং ‘জীবিত’:

আল্লাহ তাআলা কুরআনে শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ

অর্থঃ “আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বোলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো না।” (সূরা আল-বাকার, ২:১৫৪)।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি শহীদের মর্যাদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহীদ দুনিয়ার দৃষ্টিতে মৃত হলেও, আল্লাহর নিকট তারা বিশেষ এক জীবনে জীবিত, যা আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরে। শহীদ হাদিসের আলোকে মুফাসসিরগণ

বলেন, শহীদের আত্মা জান্নাতে পাখিরূপে বিচরণ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত হয়। এই অনন্য মর্যাদা একমাত্র শহীদের জন্যই নির্দিষ্ট।

২. আল্লাহর নিকট জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত:

আল্লাহ আরও বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

অর্থঃ “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে কোরো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং রিজিকপ্রাপ্ত।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৯)।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি সুস্পষ্ট করে যে, শহীদগণ আল্লাহর নিকট বিশেষ জীবন ধারণ করেন, সেখানে তারা জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিরত রিজিকপ্রাপ্ত হন। ইমাম তাবারি (রহ.) বলেন, এখানে ‘রিজিক’ বলতে জান্নাতের ফলমূল ও অফুরন্ত নেয়ামত বোঝানো হয়েছে।

৩. শহীদদের আনন্দ ও সুসংবাদ:

আল্লাহ তাআলা শহীদদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থঃ “তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানে আনন্দিত হয় এবং তারা তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্যও সুসংবাদবাহক হয় যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭০)

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, শহীদগণ জান্নাতে আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে আনন্দিত এবং দুনিয়ায় থাকা তাদের অবশিষ্ট মুমিন ভাইদের জন্য সুসংবাদ বহন করেন যে, তারাও মৃত্যুর পর এমন মর্যাদা লাভ করবে।

৪. জান্নাতের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি:

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন; এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। এটি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তাঁর ওপর ন্যস্ত সত্য প্রতিশ্রুতি।” (সূরা আত-তাওবা, ৯:১১১)।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি শহীদদের জন্য জান্নাতের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির অকাট্য প্রমাণ, যেখানে আল্লাহ নিজেকে ‘ক্রেতা’ হিসেবে ঘোষণা করে শহীদদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীরা ইসলামের মর্যাদা, সত্য ও ন্যায়ের পতাকাকে সমুন্নত রাখেন। তাই ইসলামে শহীদদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানিত মানুষের কাতারে গণ্য করা হয়েছে।

হাদিস শরীফে শহীদদের মর্যাদা, পুরস্কার ও ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদদের সম্পর্কে বহু হাদিসে আলোচনা করেছেন এবং তাদের মহান মর্যাদার সুসংবাদ দিয়েছেন। নিম্নোক্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

১. শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদদের পুরস্কার সম্পর্কে বলেন, “আল্লাহর কাছে শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে:

- প্রথম পুরস্কার (তাৎক্ষণিক ক্ষমা): তার প্রথম রক্তবিন্দু ঝরার সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সাধারণ মুমিনের জন্য তওবার প্রয়োজন হলেও, শহীদ শাহাদাতের মাধ্যমেই পবিত্র হয়ে যান।)
- দ্বিতীয় পুরস্কার (জান্নাতের স্থান দর্শন): মৃত্যুর পরপরই তাকে জান্নাতে তার নির্ধারিত স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়।
- তৃতীয় পুরস্কার (কবরের আজাব থেকে মুক্তি): তাকে কবরের আজাব ও ফিতনা থেকে রক্ষা করা হয়।
- চতুর্থ পুরস্কার (কিয়ামতের ভীতি থেকে নিরাপত্তা): তাকে মহাভীতির দিন (কিয়ামতের ভয়াবহতা) থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

- পঞ্চম পুরস্কার (ঈমানের মুকুট): তাকে ঈমান ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়, যার একটি মাত্র ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।
- ষষ্ঠ পুরস্কার (জান্নাতি স্ত্রী ও সুপারিশের ক্ষমতা): তাকে বাহান্তরজন (৭২) হরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় এবং তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে সত্তরজন (৭০) ব্যক্তির জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয়।” (জামি‘ আত-তিরমিযি: ১৬৬৩, সুনান ইবনে মাজাহ: ২৭৯৯, ইমাম তিরমিযি একে ‘হাসান সহিহ গারিব’ বলেছেন)।

২. শহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা (বান্দার হক ব্যতীত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” (সহিহ মুসলিম: ১৮৮৬)।
ইমাম নববি (রহ.)-এর ব্যাখ্যা: শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর হক সম্পর্কিত সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তবে অন্যের হক বা ঋণের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। কারণ তা বান্দার হক, যা বান্দা নিজে মাফ না করলে আল্লাহ মাফ করেন না।

৩. শহীদের রক্তের সাক্ষ্য ও সৌরভ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“শহীদ তার রক্তের রঙ ও ঘ্রাণ নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে; রঙ হবে রক্তের মতো, কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের (কস্তুরির) মতো।” (সহিহ বুখারি: ২৮০৩, সহিহ মুসলিম: ১৮৭৬)।

৪. পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“কেউ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, তবে শহীদ ছাড়া। সে জান্নাতে তার সম্মান দেখার কারণে পুনরায় দশবার দুনিয়ায় ফিরে এসে শহীদ হতে চাইবে।” (সহিহ বুখারি: ২৮১৭, সহিহ মুসলিম: ১৮৭৭)।

৫. শহীদের আত্মা জান্নাতে পাখিরূপে বিচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“শহীদদের আত্মা জান্নাতের সবুজ পাখিদের পেটের মধ্যে অবস্থান করে; তারা জান্নাতের যেকোনো স্থানে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে এবং আরশের নিচে বুলন্ত লণ্ঠনসমূহে এসে আশ্রয় নেয়।” (সহিহ মুসলিম: ১৮৮৭, সুনান আবু দাউদ: ২৫২০)।

৬. জান্নাতে শহীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও দাফনের নিয়ম

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত শহীদকে গোসল দেওয়া হয় না এবং তার রক্তাক্ত কাপড়ই তার কাফন হিসেবে গণ্য হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে বলেন, “তাদের রক্ত ও শরীর সহকারেই দাফন করো; গোসল দিয়ো না।” (সহিহ বুখারি: ১৩৪৩)।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, এই রক্তাক্ত অবস্থাই কিয়ামতের দিন শহীদের জন্য পরম সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে প্রকাশ পাবে।

৭. শহীদের হালকা মৃত্যুযন্ত্রণা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“শহীদ মৃত্যুর যন্ত্রণা ততটুকুই অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে অনুভব করে।” (জামি‘ আত-তিরমিযি: ১৬৬৮, সুনান ইবনে মাজাহ: ২৮০২)।

এটি শহীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া ও উপহার।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষার আবশ্যিকতা

বর্তমান বিশ্ব ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ‘জিহাদ’ শব্দটির অপব্যবহার এবং ভুল ব্যাখ্যা মানবসমাজে এক গভীর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। একদিকে ইসলাম-বিদ্বেষী মহল জিহাদকে সন্ত্রাস, সহিংসতা ও উগ্রবাদের সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করছে; অন্যদিকে কিছু পথভ্রষ্ট ও চরমপন্থী গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক বা আদর্শিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিম যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে।

এই দ্বিমুখী সংকটের ফলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রকৃত, ভারসাম্যপূর্ণ ও শরিয়তসম্মত শিক্ষা জানা এবং তা সমাজে প্রচার করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ জিহাদের সঠিক উপলব্ধি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকল স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। নিচে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষার আবশ্যিকতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. উগ্রবাদ ও চরমপন্থা প্রতিরোধে:

বর্তমান যুগের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো যুবসমাজের একটি অংশের উগ্রবাদ ও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকি পড়া। অনেক উগ্রপন্থী গোষ্ঠী জিহাদকে কেবল যুদ্ধ, সংঘাত ও রক্তপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে উপস্থাপন করে, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী। জিহাদের সঠিক শিক্ষা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে যে ইসলামে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠন নিজের ইচ্ছামতো যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না। বরং জিহাদ একটি দায়িত্বশীল, নীতিনিষ্ঠ ও শরিয়ত-নিয়ন্ত্রিত বিষয়। এর উদ্দেশ্য অরাজকতা সৃষ্টি নয়; বরং জুলুম প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণ। তাই জিহাদের সঠিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানই উগ্রবাদী অপব্যাক্যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

২. আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক সমাজ গঠনে:

বর্তমান সমাজ ভোগবাদ, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, হিংসা, স্বার্থপরতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত। এই প্রেক্ষাপটে মানুষের নিজের প্রবৃত্তি, লোভ ও অন্যায় প্রবণতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে আত্মসংযম, তাকওয়া এবং নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা দেয়। ব্যক্তি যখন নিজের ভেতরের অন্যায় প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন সে ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও সামাজিক অন্যায় থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হয়। ফলে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়।

৩. জ্ঞান, চিন্তা ও কলমের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে:

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। একটি মিথ্যা সংবাদ, অপপ্রচার বা বিভ্রান্তিকর মতাদর্শ মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ-কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তাই জ্ঞান, যুক্তি, গবেষণা, শিক্ষা এবং সঠিক তথ্য প্রচারের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা, ইসলামবিরোধী অপপ্রচারের জবাব দেওয়া, সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং অজ্ঞতা দূর করার জন্য জ্ঞান ও চিন্তার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, গবেষণা পরিচালনা করা, সংসাংবাদিকতা চর্চা করা এবং সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়াও বর্তমান যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রাম।

৪. মানবকল্যাণ ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে:

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলাম মানুষকে বৈধ উপার্জন, কঠোর পরিশ্রম এবং সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। নিজের শ্রম, মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে হালাল জীবিকা অর্জন করা এবং সেই সম্পদ থেকে দরিদ্র, এতিম, অসহায় ও মজলুম মানুষের সহযোগিতা করা ইসলামী দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ইসলামের মানবিক যুদ্ধনীতি ও মানবাধিকার তুলে ধরতে:

বর্তমান বিশ্বের বহু সংঘাত ও যুদ্ধে— নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হচ্ছে। যুদ্ধের নৈতিক সীমারেখা প্রায়ই উপেক্ষিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের যুদ্ধসংক্রান্ত নীতিমালা ও মানবিক মূল্যবোধ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। ইসলাম অন্যায় আত্মসন, নিরীহ মানুষ হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপ্রয়োজনীয় ধ্বংসযজ্ঞকে সমর্থন করে না। বরং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও ন্যায়, সংযম এবং মানবিকতার শিক্ষা প্রদান করে। এ কারণে জিহাদের প্রকৃত নীতিমালা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রচার করা বর্তমান বিশ্বে শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা জানা ও তা সমাজে প্রচার করা কেবল একটি ধর্মীয় প্রয়োজনই নয়, বরং একটি সামাজিক ও মানবিক আবশ্যিকতা। জিহাদকে তার প্রকৃত অর্থে আত্মশুদ্ধি, সত্য প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানচর্চা, মানবকল্যাণ এবং জুলুম প্রতিরোধের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা হিসেবে বুঝতে পারলেই উগ্রবাদ, বিভ্রান্তি ও অপব্যর্থতার অবসান ঘটবে। তখন জিহাদ সংঘাতের প্রতীক না হয়ে ন্যায়, দায়িত্বশীলতা এবং কল্যাণমুখী পরিবর্তনের এক ইতিবাচক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপসংহার

জিহাদ হলো নুসরতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং 'আল-আমরু বিল মারুফ ওয়ান নায়ি আনিল মুনকার' ও 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'-এর একটি প্রকার। জিহাদ ঈমানের মানদণ্ড ও দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখর হিসেবে স্বীকৃত। এটি মানুষকে আত্মসংযম, ধৈর্য, সত্যবাদিতা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। পাশাপাশি এটি সমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন, শক্ত ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যক্তি ও সমাজের আত্মিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য; এবং যার ফজিলত কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত অসংখ্য পার্থিব ও পরলৌকিক প্রতিদানে সমুজ্জ্বল।

তথ্যসূত্রঃ

আল-কুরআন, আল-হাদিস, আয়াতুল জিহাদ, আর-রাহীকুল মাখতুম, লিসানুল আরব, ফাতহুল বারি, আল-মিনহাজ, ফিকহুল জিহাদ, যাদুল মাআদ, তাফসিরে ইবনে কাসির, ইহইয়া উলুমিদ্দিন, তাফসিরে কুরতুবি, মাসিক আল-কাউসার